ইসলাম ও রাষ্ট্র

মুস্তফা হুসাইন

১৮শ শতকের শেষে আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের বদৌলতে সকলপ্রকার ধর্মীয় শাসনের বিলোপ ঘটিয়ে স্বেচ্ছাচারি, আত্মপূজারী ও ক্ষমতাপূজারিরা -দুই হাজার বছর আগের আদিম, বর্বর, রক্তপিপাসু রোমানদের অনুকরণে- পুনরায় প্রথমবারের মতো কায়েম করে আধুনিক রিপাবলিকান রাষ্ট্র বা প্রজাতন্ত্র। পরবর্তী একশো বছরের তীব্র যুদ্ধ এবং উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের ফলে, ইলাহী শাসনের পরিবর্তে মানবীয় শাসনের ধারণা ইউরোপ থেকে ক্রমান্বয়ে গোটা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে -যেখানে রাজনৈতিক কাঠামো, ঐক্য ও বিধিবিধানের মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহ তা আলার আনুগত্য ও মূল্যবোধের দাবি- দেখা দেয় শুন্যতা। এশূণ্যতা পূরণে তারা আল্লাহ তা আলার আনুগত্য ও নির্ধারিত মূল্যবোধের পরিবর্তে জাতিয়তাবাদী রাষ্ট্র নামক সংগঠনকে আনুগত্য ও মূল্যবোধের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়;। আইন ও মূল্যবোধকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক না বানিয়ে, বরং রাষ্ট্রকেই আইন ও মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রক বানিয়ে দেয়া হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক থেকে নিয়ে জনসাধারণ—সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করে আইন ও মূল্যবোধ। বিপরীতে, আধুনিক রাষ্ট্রই আইন ও মূল্যবোধের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তবে সংক্ষেপে এবং সহজে রাষ্ট্রকে এভাবে বোঝা যেতে পারে:

> আধুনিক রাষ্ট্র একটি বিশেষ বলপ্রয়োগকারী সংগঠন। যে সংগঠন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে দমনপীড়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
>
> (V. Lenin Selected Works (Moscow, 1960), vol. 2, p.320)

আর, আধুনিক রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ চলতেই থাকে, কারণ রাষ্ট্রের কোনো মূল্যবোধ নেই। রাষ্ট্র নামক সংগঠনটি (রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্র) কেবল নিজ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের স্বার্থেই কাজ করে থাকে। আর কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন পৌঁছে যায় চরম মাত্রায়। তারা জনগণের জন্য ততটুকুই কাজ করে থাকে, যতটুকু না করলে শাসনের গ্রহণযোগ্যতা টিকানো যাবে না। পাশাপাশি, তাদেরকে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি স্তরে হস্তক্ষেপ করতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিতে হয়; যেন জনসাধারণের মানবীয় মূল্যবোধ জেগে না উঠতে পারে এবং রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আনুগত্য বজায় থাকে। এ কথাগুলো নিছক তত্ত্ব নয়, বরং বিগত দুশো বছরের আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে নিরেট বাস্তবতা।

বিপরীতে, ইসলামি রাষ্ট্রের শুরু থেকে শেষ অবধি আল্লাহ তাআলার সুনির্ধারিত নির্দেশ ও ইসলামি মূল্যবোধের কাছে দায়বদ্ধ। এমনকি জনসাধারণের চেয়েও অধিক দায়বদ্ধ। তাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চাইলেও জুলুম করতে সক্ষম নয়। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে শাসক বা শাসন ক্ষমতার ওপরতলার কেউ নিপীড়ন করতে পারে, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের মতো ঢালাওভাবে, অনায়াসে তা করা সম্ভব না। পাশাপাশি, ইসলামি ভূখণ্ডে যেহেতু শাসন, সমাজ ও ব্যক্তি সবারই মূল্যবোধ ও করণীয় আল্লাহ তাআলার বিধান কর্তৃক সুনির্ধারিত, তাই রাষ্ট্র নিরাপত্তা ও কল্যাণ পৌঁছানোর বাইরে সমাজ ও ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না, করার কথা ভাবতেও পারে না। এটিই ১২০০ বছরব্যাপী ইসলামি শাসনের ইতিহাস সাক্ষী দেয়।

ইসলামি রাষ্ট্র ও আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপারে এই মৌলিক ধারণা না থাকার কারণেই বহু ইসলামপন্থী আজ "ইসলামি প্রজাতন্ত্র" নামক পরস্পরবিরোধিতার স্বপ্ন দেখেন ও দেখান। অথচ, ইসলামি শাসনব্যবস্থা বর্তমানের আধুনিক পশ্চিমা-প্রভাবিত সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাসনব্যবস্থা। মাত্র দুই-তিনশো বছরের ক্ষয়িষ্ণু ও বর্বর আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের ব্যর্থ ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রচেষ্টার ভিত্তি হচ্ছে—১২০০ বছর দীর্ঘ শারঈ শাসনব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপারে চরম অজ্ঞতা। আরও ভালো করে বললে আধুনিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার ছকের বাইরেও যে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাজার হাজার বছরব্যাপী বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকা। আর ভাসা ভাসা যদি কিছু জ্ঞান থেকেও থাকে, তাও বর্তমান সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার সাথে তুলনা করে বিশ্লেষণে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট

না।

প্রাচীন রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের সমালোচনায় "স্বঘোষিত গণতান্ত্রিক সুশাসন"-এর ধ্বজাধারীদের থেকে যে প্রশ্নের উত্তর কখনোই পাওয়া যায় না তা হলো:

"ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক, সুলতান বা আমীরের আসলে কতটুকু ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ছিল?"

বাস্তবতা হলো, আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মতো ইসলামি শাসনব্যবস্থা কখনোই সার্বভৌম ছিল না। সামরিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে সহিংসতার সক্ষমতা, আর ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতার মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুসলিম শাসক সর্বোচ্চ যা পারবে, তা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু লোকের সম্পদ কেড়ে নেয়া, কিংবা বন্দি বা হত্যা করা। যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে আক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা নিজ স্বার্থে স্বেচ্ছাচারী আইন জারি করে ফায়দা লুটলেও, ঐ স্বেচ্ছাচারী ও অনৈতিক আইনের বলি হয় সমাজের সকল মানুষ। কালাকানুনের নিষ্পেষণ চলতেই থাকে যতদিন ওই আইন জারি থাকে ততদিন পর্যন্ত।

বিপরীতে, ইসলামি শাসনব্যবস্থায় শাসকদের পক্ষে শারীআর সীমানা এবং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রে কখনোই আধুনিক সেক্যুলার রিপাবলিক শাসকদের মতো ক্ষমতা চর্চার সুযোগ ছিল না, নেই, হবেও না। সেক্যুলার রাষ্ট্রের শাসক যেমন নিজস্ব সুবিধা মোতাবেক আইন প্রণয়ন করতে পারে, ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা তা কখনোই পারেনি। বরং, ইসলামি আইন মেনে চলা ছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকে কেবল আল্লাহ তাআলার ও তার নাযিলকৃত শারীআ'র।

বিপরীতে সেক্যুলার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকে জননির্বাচিত বা অনির্বাচিত শাসকের।

শুরু থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব ছিল মানুষ যেন তাওহীদ ও নিরাপত্তার চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে নিতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ইসলামের দাওয়াহ, কল্যাণকর কাজের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব ছিল বহিঃশক্তির হাত থেকে জাতিকে প্রতিরক্ষা দেয়া এবং সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয় এমন বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা। সাধারণভাবে, ইসলামি রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের দিকগুলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে অনেকটাই স্বাধীন, বা বলা ভালো প্রায় পূর্ণ স্বাধীন। নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত না হলে, সাধারণত কোনো স্বৈরাচারী শাসকও শারঈ বিচার ফয়সালা বা সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। এমনকি অধিকাংশ সময়ই চাওয়া সত্ত্বেও তা করতে পারতেন না। কেননা ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করত রাষ্ট্রীয়ভাবে শারীআ প্রতিষ্ঠা করার ওপর।

ব্যক্তিগত পরিসরে শাসকরা পাপাচার বা ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হলেও, কিংবা বিরোধিতাকারীদের সাথে সীমালঙ্ঘন করলেও—সমাজের নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উলামায় কেরামের বিপরীতে তারা ব্যাপকভাবে অবস্থান নিতে পারতেন না। কেননা তাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ শাসক হতে বা টিকে থাকতে পারতেন না। ফলে উলামায়ে কেরামের নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা এবং ইসলামি সমাজের অভিজাত ও গ্রহণযোগ্য ওয়াকিফদের দ্বারা সমন্বিত, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধে প্রবল ইসলামি সমাজে রাষ্ট্রের ক্ষমতাচর্চার সুযোগ তেমন ছিল না বললেই চলে। শাসকবর্গ সমাজের অভ্যন্তরে বা সকল স্তরে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চা করতে পারত না। শুধু ইসলামি শাসন না, বিশ্বব্যাপী হাজার বছর ধরে স্থায়ী হওয়া প্রতিটি শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন মাত্রায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

অর্থাৎ, ইসলামি শাসনামলে রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের ব্যাপক সুযোগ ছিল না। বরং রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুসংহতকরণে সমাজ বা গোত্রের নের্তৃবর্গ (যারা নিজ যোগ্যতাবলেই মানুষের নেতা হতেন, ভোটডাকাতি বা অস্ত্রের জোরে না) এবং উলামায়ে কেরাম তথা বিচারকদের স্বাধীনতা দিয়ে সমর্থন আদায় করতেন। সমাজ থেকে রাষ্ট্রের মূল প্রাপ্তি ছিল সরকারি কর্মচারী, সামরিক সক্ষমতা অর্জনে প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থ সংগ্রহ (যা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যাকাত, ভূমিকর ইত্যাদি থেকে আসত) ।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিচারব্যবস্থা না হয় স্বতন্ত্রভাবে উলামায় কেরাম বা কাজিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো; কিন্তু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব হতো?

ইসলামি রাষ্ট্রের অধিকাংশ মাসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ইয়াতিমখানা, বসার জায়গা, বাগান, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা, লাইব্রেরি, দোকান, বাজার, রাস্তাঘাট, সেতু, লঙ্গরখানার মতো প্রায় সকল কল্যাণমূলক কাজ হয়েছে মূলত ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ এসকল কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করত, কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায়; কোনো

জাতীয়তাবাদী চেতনা বা রোমান্টিকতার সাময়িক ঘোর থেকে নয়।

এসকল ব্যয়বহুল ও বিশাল কাজ সম্পাদিত হতো শারীআর অন্যতম বিধান "ওয়াকফ" ও "যাকাত-সাদাকা" র মাধ্যমে। ওয়াকফ হল কোনো মুসলিম ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজ সম্পত্তি দান করে দেয়া। সাধারণত কোনো আমানতদার ও দক্ষ মুসলিম ব্যবস্থাপক বা নেতাকে ওয়াকিফ বানিয়ে মুসলিমরা নিজেদের সম্পত্তি দান করে দিতেন। আর ওয়াকিফরা তা প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন।

মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত সদাকা ও ওয়াকফের ওপর ভিত্তি করে যেভাবে ইসলামি সমাজ সুসংহত হতো একইভাবে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিকশিত ও প্রসারিত হতো সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলামের এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামে রাষ্ট্র কল্যাণের পরিপূর্ণতায় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরও কল্যাণ সাধনে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববোধ। ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে থাকা, বিভিন্ন প্রদেশ, অঞ্চল বা গোত্রে বিভক্ত সমাজ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজেদেরকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট থাকত।

ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যত মারাত্মক স্বৈরাচারীই অধিষ্ঠিত হোক না কেন, আধুনিক সেক্যুলার শাসনকদের মতো ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সত্তা ও উপাদানকে রাজনৈতিক শোষণ ও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ তাদের কখনোই ছিল না। বিপরীতে, আজকের আধুনিক কর্তৃত্ববাদী প্রজাতন্ত্রে বিয়ের মতো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ও রাষ্ট্রকে না জানিয়ে করা যায় না। নিজের টাকায়, নিজের জমিতে ব্যাবসা করতেও লাগে ট্রেড লাইসেন্স। প্রতিটি খরচের সাথে উপরি হিসেবে দিতে হয় ট্যাক্স। আফসোস নাগরিকদের জন্য, যারা গোলামিকে স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাকে গোলামি ভেবে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ডুবে আছে।

ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মৌলিক দায়িত্ব ছিল আটটি। যেমনটা, ঐতিহাসিক ইবনু খালদুন উল্লেখ করেছেন:

১) শারীআ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন করা;

২) হুদুদের শাস্তি প্রদান;

৩) সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ;

৪) সীমান্ত সুরক্ষিত করা এবং রাস্তাঘাট ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৫) গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা;

৬) সাদাকা, যাকাত ও অন্যান্য বৈধ কর আদায় ও বণ্টন করা;

৭) কাজি বা বিচারক নিয়োগ, তদারকি ও বরখাস্ত করা। উল্লেখ্য, কাজির বিচারকার্যে হস্তক্ষেপের সুযোগ শাসকদের থাকত না। এছাড়া বাজার নিরীক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ, তদারকি ও দরখাস্ত করা; এবং

৮) ইয়াতীম, মিসকীন, দুস্থ ও অভিভাবকহীনদের দেখাশোনা করা।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিচারকদের সবাই ছিলেন শারীআর জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরাম; যাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় মাদ্রাসার শিক্ষক বা মুফতী। স্বাভাবিকভাবে, শাসককে খুশি করতে চাইলেও এমন ব্যক্তিদের পক্ষে শারীআ আইনের বাইরে গিয়ে বিচার করার বিষয়টি কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এমনকি, প্রশাসকদের বিচার বা বরখাস্ত করাও বিচারক বা কাজিদের অন্যতম দ্বায়িত্ব ছিল।

প্রকৃত ক্ষমতার বিভাজন ("Separation of Power") আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে কখনোই সম্ভব নয়। কেননা, রাষ্ট্রীয় শক্তিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারে মগ্ন রাজনৈতিক নের্তৃত্ববৃন্দ এবং পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী-কর্পোরেশনগুলো কখনোই তা হতে দিবে না। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ক্রমাগত এমন সব আইন ও প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো হয় যাতে ব্যক্তি থেকে সমাজ কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালী না হতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখা কেন জরুরি, মূল্যবোধহীন স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক নেতা আর ব্যবসায়ীরা তা খুব ভালো করে জানে। লিবারালিস্ট পুঁজিপতি ও সেক্যুলার নেতাদের দেবতা জর্জ হেগেল বলে গিয়েছিল :

> "Individuals were defined by the state; the state may be created by individuals, but eventually it supersedes them."
>
> "ব্যক্তিরা সংজ্ঞায়িত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা; রাষ্ট্র যদিও ব্যক্তিদের মাধ্যমে গঠিত হয় কিন্তু একপর্যায়ে রাষ্ট্র তাদের ওপর প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করে।"

অর্থাৎ, আধুনিক রাষ্ট্রের গঠনই এমন যে, ব্যক্তি ও সমাজের উপর সর্বব্যাপী আধিপত্য কায়েম অত্যন্ত সহজ।

অন্যদিকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ঠিক বিপরীত। ইসলামি রাষ্ট্রে মানুষ রাষ্ট্রের দাস নয় যে, রাষ্ট্র বা শাসকের পরিচয়কে চূড়ান্ত সাব্যস্ত

করবে। বরং, পরিচয় সাব্যস্ত হবে আল্লাহ তাআলার দেয়া পরিচয় মোতাবেক। ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ব্যক্তি বা সমাজকে অতিক্রম করে না। রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়, বরং ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سيد القوم خادمهم

"কওমের নেতা তাদের খাদেম।"

আধুনিক সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রে নাগরিকরা শাসকের গোলাম ও উপাসক। আর ইসলামি রাষ্ট্রে খলিফা বা আমির হলেন জনগণের সেবক। সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্তি ও সমাজের ঊর্ধ্বে। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে হলো শারইয়াহ, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের উপর ব্যাপক আধিপত্য অর্জন অসম্ভব। সেক্যুলার রাষ্ট্র ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ইসলামে রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে; কেননা, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের বিকশিত হওয়ার মাধ্যমেই রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করে।

তাহলে কতই-না দূরবর্তী এই দুই শাসনব্যবস্থার হাকিকত, উদ্দেশ্য ও কাঠামো।

কোনো সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি যদি ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্বৈরাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনাধীন রাষ্ট্রকে আধুনিক যুগের কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের (চাই সেটা পশ্চিমা বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র হোক কিংবা প্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্র) সাথেও তুলনা করে তবে সে দেখতে পাবে—নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে হাজ্জাজি রাষ্ট্রের সাথেও আধুনিক রাষ্ট্রের কত বিস্তর ফারাক! হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি, অশ্লীলতা, অপুষ্টি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণের মতো মানবতা-বিধ্বংসী উপাদানের বোনা বীজ আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোতে মাত্র একশো বছরেই পচে-গলে হয়ে বিশ্বকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ইসলামি শারীআ দ্বারা সুরক্ষিত ব্যক্তি ও সমাজ ও রাষ্ট্রে যা কখনো কল্পনাই করা যায়নি।

এমনকি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও, ইসলামি সুশাসন ও আধুনিক সেক্যুলার দুঃশাসনের তুলনা দিতে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ.কে. এম শাহনেওয়াজ বলেন,

> "এগারো-বারো শতকে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ শাসকরা বাংলার রাজদণ্ড নিয়ে এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হয়েছিল। শক্তির দাপটে এরা এতটাই মত্ত ছিল যে, সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজনই মনে করেননি।
>
> ফল হিসাবে তেরো শতকের সূচনায় বিদেশি তুর্কি রক্তের ধারক মুসলমান অভিযানকারীদের আক্রমণের সময় সাধারণ মানুষ সেন শাসকদের পাশে দাঁড়ায়নি। তাই মুসলিম শক্তির প্রথম আঘাতেই তাসের ঘরের মতো উড়ে যায় সেন শাসনের ভিত্তি।
>
> ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও একশো বছর কম দাপট দেখায়নি। 'ব্লাডি নেটিভ' বলে অবজ্ঞা করেছে এদেশের মানুষকে। পরিণতিও একই হলো। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলেও লোভী বাণিজ্য বুদ্ধির কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।
>
> উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ প্রশাসন ঠিকই বুঝেছিল বণিকদের দিয়ে রাজনীতি চলে না। রাজনীতি করবে রাজনীতিকরা। তাই তারা বণিকদের হটিয়ে রানীর শাসনই প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সত্যটি মানতেই হবে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা না করে অন্যকিছু দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে আবিষ্ট করে রাখা যায় না।
>
> মধ্যযুগে বাংলার বিদেশি সুলতানরা সাধারণ মানুষকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা। তাই তারা দীর্ঘ দুই শতাধিক বছর-স্থায়ী বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সুলতানদের পতন জনবিক্ষোভে হয়নি। শক্তিমান আরেক বিদেশি মুসলমান শক্তি মোগলদের আক্রমণে পরাভূত হয়েছিলেন সুলতানরা।"

(????? ????????, ??? ??'????)

আর প্রজাতান্ত্রিক দুঃশাসনের ব্যাপারে বলেন,

> "শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো উপমহাদেশেই নির্বাচনে টাকার খেলা এখন ওপেন সিক্রেট। নির্বাচনী গণতন্ত্র এখন ভিন্ন চরিত্র পেয়ে গেছে। তাই এ যুগে নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন কম হয়। মনোনয়ন পাওয়া থেকে শুরু করে ভোটার সংগ্রহ, পেশিশক্তি সংগ্রহ, প্রশাসন ম্যানেজ করা সব ক্ষেত্রেই টাকা ঢালতে হয়। এ হচ্ছে এক রকম অদ্ভুত গণতন্ত্র গণতন্ত্র খেলা। এতসব টাকা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! জোগান দেন ব্যবসায়ীরা, ঘুষখোর আমলারা আর কমিশন বাণিজ্যে ফুলে ওঠা রাজনৈতিক নেতারা। সুতরাং এদের ঋণ খেলাপি হওয়ার মতো অন্যায় করার লাইসেন্স ক্ষমতাসীনদেরই দিতে হয়।

ঘুষ খাওয়া তাদের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে যায় আর বৈধতা পেয়ে যান তদবির বাণিজ্য ও কমিশন বাণিজ্যে যুক্ত নেতারা। এ সূত্রেই সংসদে ক্রমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছেন ব্যবসায়ী ও আমলারা। তাদেরই কেউ কেউ সরকারদলীয় ফান্ডে পাঁচ কোটি কালো টাকা দান করেন পঞ্চাশ কোটি কালো টাকা আয় করার ভরসাতেই। এরপর এক সময় এসব টাকা সাদা করে ফেলাও কঠিন কিছু নয়। এমন বাস্তবতায় ক্ষমতার কাছে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র বাসনা যাদের, তাদের পক্ষে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ রচনা করা কঠিন। ফলে সরকারগুলোর সাধ্য কি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে!

এখন রাজনীতি করার সঙ্গে ধনী হওয়ার একটি স্বপ্ন-কল্পনা কাজ করে। তাই যে দলই ক্ষমতাসীন হয় সেদলের নেতাদের মধ্যে একটি দাবি তৈরি হয়ে যায় অর্থশালী হওয়ার পথ পাওয়ার। তাই অনেকেই প্রায় শূন্য থেকে বড় ব্যবসায়ী হয়ে পড়েন। ক্ষমতার দাপটে প্রচুর ব্যাংক ঋণ পেতে থাকেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তদবির বাণিজ্য, কমিশন বাণিজ্যে ফুলে উঠতে থাকেন। বড়দের দেখে ছোটরাও দাবিদার হয়ে পড়ে। গ্রামগঞ্জে সর্বত্র এদের দাপট দেখা যায়। লাইসেন্স বাগিয়ে রাতারাতি অনেকে ঠিকাদার বনে যান। লুটেপুটে খেতে থাকেন সবাই। বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে গেলে তাকে নিবৃত্ত করা কঠিন। আর ক্ষমতার রাজনীতির সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এদের কিছু একটু দিয়ে পেলেপুষে না রাখলে দল চালাবেন কেমন করে! সুতরাং এসবের কারণে যে যাতনা সৃষ্টি হয়, এর বিষময় ফল ভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকেই।"

(□□□□□ □□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□'□□□□)

আফসোসের বিষয় তো এটা নয় যে, ইসলামের শত্রু সেক্যুলার ও ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানরা ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে অজ্ঞতাবশত আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র নিয়ে উল্লসিত। এও পরিতাপের বিষয় না যে, সাধারণ মুসলিমরা দুশো বছরের প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ ও সত্তর বছরে আদর্শিক উপনিবেশবাদের শিকার হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়ে আছে।

বরং পরিতাপের বিষয় হলো, সেক্যুলার শাসনের পরিবর্তে যারা ইসলামের শাসন চেষ্টায় লিপ্ত, সেই ইসলামপন্থীগণই আজ সেক্যুলার রিপাবলিকের ইসলামিকরণের হীন ও আত্মপ্রবঞ্চিত চেষ্টায় লিপ্ত। সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিলুপ্তকরণ বাদ দিয়ে আজ তারা সেক্যুলার শাসনকে শক্তিশালীকারী 'গণতন্ত্রের' মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন। এ যেন পেটের ব্যারামে ভোগা রোগীর বিষ খেয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা।

যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র (nation-state), আর আমরা চাচ্ছি এই রাষ্ট্রব্যাবস্থাকে বিলোপ করে ইসলামের শাসন ফিরিয়ে আনতে।

তাই উস্তাদ মওদুদির বক্তব্য থেকে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনব্যাবস্থার তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে ধারণা পেতে উস্তাদ মওদুদি রহ.'র বক্তব্য তুলে ধরছি-

"আমরা যে রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করেছি, তার প্রকৃত রূপটা কি? কি তার প্রকৃতি? কি তার ধরণ? কি তার বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয়? – তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জাতীয়তাবাদের নাম গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্য সব ধরণের রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরণের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে 'IDEOLOGICAL STATE' বলবো। এমন আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিল না। আজও পৃথিবীতে এ ধরণের কোন আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই।

প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে।

খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পূর্ণাঙ্গ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহবরে তলিয়ে যায়।

কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে প্রচার করে। এমনকি এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের যাবতীয় তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে।

পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সেই আদর্শ নীতি, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এই আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা অপরিচিত এবং যেহেতু বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয়, স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এমন একটি রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা (IMPLICATIONS) অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি, ও সমাজ বিজ্ঞান (Social science) থেকে, তাদের মন মস্তিষ্কে এ ধরণের আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পায় না।

উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশেও এ ধরণের লোকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে। জাতীয় রাষ্ট্র (National State) ছাড়া আর কোনো ধরণের রাষ্ট্রের কথা কল্পনাও করতে পারেনা। কারণ, তাদের মনমস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই উপমহাদেশেও যারা সে ধরণের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এ জটিল সমস্যায় জর্জরিত।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে কেবল সেই 'জাতীয় রাষ্ট্রের' চিত্রই বারবার তাদের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ এরা কেবল জাতি পূজার (Nationalistic Ideology) বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে।

তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তাভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোন কর্মপন্থাই তাদের নজরে পড়েনা। এই ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও ওসব উপায় উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে।

তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' (Majority Rule) এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হবে। আর সেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের 'অধিকার' সংরক্ষিত হবে।

তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি (National Minority) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তা শক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে।

এসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তার উম্মাহ্, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এই শব্দগুলো তাদের কাছে জাতীয় ধর্মবাদের জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্যবশতঃ তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভান্ডারে তৈরি করাই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধে পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে একথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না যে, এ ধরণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কার্যসূচি তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারেনা। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অংগ একেকটি তীক্ষ্মধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাকে বিনাশ করে দেয়।

আদর্শবাদী রাষ্ট্র যে ধারণা (IDEA) পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমাদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের'

কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সামনে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন মগজ, ভাষা বক্তব্য, কাজ কর্ম, তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের উপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কী করে এই মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে সক্ষম হবে? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্বমানবতাকে আহ্বান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আছে, জাতিপূজা এবং জাতীয় রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইর মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে? লোকদেরকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তি সংগত কাজ হতে পারে?

ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানবজাতিরও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট।

এই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।

এই শাসন পরিচালনার কাজে এমন সব লোকই অংশীদার হবে, যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এরূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান কাজ পরিচালনা করতে হবে যে, সামষ্টিকভাবে আমাতের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই গোপন নেই।

এই চিন্তা প্রতিটি মূহুর্ত তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের উপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল আট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পূঞ্জিভূত করার জন্যে আমাদের উপর খিলাফতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর এই জন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁরই দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এ কাজে যদি অনূ পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহর আদালতে এর শাস্তি অবশ্যি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকি না কেন?

এই মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular States) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা। এক স্বাতন্ত্রধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর ও খাজন পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সব

বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী, এমনকি চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরি করা হয়েছে এবং সে ধরণের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালিকা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর সম্মুখে নিজেদের দায়ত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে তীব্র অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অধিক মূল্যবান।

যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন কানুন নিয়মনীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। তাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত আর জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে তাদের গর্দান হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে তাদের মন মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধনসম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধনদৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর হবার নয়।

এইরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণও যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, জুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী।

এ ধরণের এবং কেবলমাত্র এধরণের লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবলমাত্র এরূপ লোকেরাই ইসলামী হুকুমাত পরিচালনা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী (Utilitarian Mentality) লোকদের দ্বারা কিছুতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারেনা।

বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এরূপ লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উইপোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরি করে। এদের মগজে না আছে আল্লাহর ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের 'ধান্দা'।"

("ইসলামী বিপ্লবের" পথ বই থেকে গৃহীত)

আশা করি, ইসলাম ও রাষ্ট্র প্রশ্নে সমাধান কি তা আমাদের নিকট কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়াও,

স্মরণ রাখতে হবে, উস্তাদ মওদুদি রহ. এর ভুলত্রুটি থাকতেই পারে, কিন্তু গোলাম আজম রহ. বা পরবর্তী জামাতে ইসলামির মানহাজ ও কর্মনীতির সাথে উস্তাদকে মিলিয়ে না ফেলাই ইনসাফের দাবী। বরং, খেয়াল করুন বর্তমানের জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক 'ইসলামী' দল যে কল্যাণরাষ্ট্র, জাতিয়তাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা আচ্ছন্ন- তাদের তীব্র সমালোচনাই মাওলানা মওদুদির বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

গুরুত্ব বিবেচনায় সংক্ষেপে আবারো বলছি,

আধুনিক জাতীয়তাবাদী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা রিপাবলিক মানেই তা আগাগোড়া সেক্যুলার রাষ্ট্র, যার উদ্ভব মাত্র দুশো বছর আগে ফ্রান্সে। সেক্যুলার রাষ্ট্র চায় মানুষকে নিজের দাস বানাতে। আর ইসলামি রাষ্ট্র চায় মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতে পূর্ণতা দান করতে এবং মানুষকে ইসলামী সাম্য, অনুগ্রহ ও স্বাধীনতা দ্বারা মুক্তি দিতে।

আগুনকে যেভাবে কখনো পানিতে রূপান্তরিত করা যায় না, সেক্যুলার রাষ্ট্রকেও তেমনই কেবল চেয়ারের লোক পরিবর্তন করে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব না। বরং, সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামো ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে বিলোপ করেই কেবল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(২)

সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র ও ইসলামের ব্যাপারে সাধারণ ধারণালাভের পর এ বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকে না যে, জমিনে তাওহীদ ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক হতে পারে, রাজতান্ত্রিকও হতে পারে।

মূল বিষয় হলো,

ক) আল্লাহর উর্ধ্বে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয়া এবং,

খ) আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় সংবিধান, আইন ও অধ্যাদেশকে প্রাধান্য দেয়া।

সুতরাং, আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধানতম বাধা হচ্ছে—আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> هُوَ الَّذِىٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ
>
> "তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

অর্থাৎ, জমিনের সবার ওপর আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে দ্বীনের বিজয়ী করাই ছিল নবি আলাইহিমুস সালাম ও কিতাব প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। এটাই তাওহীদের দাবিকে পূর্ণতা দানের অন্যতম মাধ্যম, যে ব্যাপারে উদাসীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

> وَقَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَا تَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّيَكُوۡنَ الدِّيۡنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ‌ ۚ فَاِنِ انْتَهَوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ
>
> "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।"

তাফসিরে মুয়াসসারে বলা হয়েছে,

> "এ (কিতালের) উদ্দেশ্যের একটি দিক হচ্ছে ফিতনা না থাকা এবং আরেকটি দিক হচ্ছে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহর জন্য হবে। কেবলমাত্র এ সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করাই মুসলিমদের জন্য ফরয।"

এজন্যই ইসলামে রাষ্ট্রক্ষমতা হচ্ছে ইবাদাতে পূর্ণতালাভের অন্যতম মাধ্যম। তামকিন বা কর্তৃত্ব ছাড়া তাওহীদ ও ইবাদাত পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তামকিন ছাড়া শারীআ বাস্তবায়ন ও মুসলিমদের নিরাপত্তা-বিধান সম্ভব হয় না। শারীআর তামকিনের মাধ্যমে কিতাব ও নবী সা প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়।

শায়খ আবু কাতাদা বলেন,

> "আল্লাহর দ্বীনে ইমামাত বা নের্তৃত্ব একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। ইমাম হওয়া ছাড়া পৃথিবীতে মুসলিমের ইবাদাত বাস্তবায়িত হয় না। আমরা ইমামাত ও ইমাম দ্বারা ঐ বিষয়গকে বোঝাচ্ছি, যা অর্জিত হয় বিজয় ও শক্তির মাধ্যমে। ক্ষমতাশীল হওয়ার মাধ্যমে। তাই পৃথিবীতে মুসলমানদের তামকিন যত বৃদ্ধি পাবে, তাদের ইবাদাতও তত বৃদ্ধি পাবে।
>
> অনেক কুরআনী আয়াত ও নববি আদেশ এমন আছে, ক্ষমতায় থাকা ছাড়া যেগুলোর ওপর আমল করা সম্ভব না। যার ফলে আল্লাহর ইবাদাতে অপূর্ণাঙ্গতা থেকে যায়। হুদুদ, কাফেরদের ওপর কর্তৃত্বশীল থাকা এবং এমন অন্যান্য আদেশগুলোর ওপর কোনো মুসলমান ক্ষমতা ছাড়া আমল করতে পারবে না।"

সুতরাং, ইবাদাত বাস্তবায়নের জন্য তামকিন ও রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রাষ্ট্র নিজে স্বতন্ত্র বা চূড়ান্ত কোনো উদ্দেশ্য না, যেমনটা সেক্যুলার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মোহগ্রস্ত 'ইসলামি' দল মনে করে থাকে। আর এই ভুল বুঝের কারণে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

অজুহাতে তারা তাওহীদ ও ইবাদাতের মৌলিক বিষয়কে দেয়ালে ছুড়ে ফেলে।

ইসলামি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হচ্ছে শারীআ আইন প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে বিধি বিধান হবে কেবলমাত্র কুরআন সুন্নাহ হতে আহরিত। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এই রাষ্ট্র জানান দেবে, হুকুম আহকাম একমাত্র আল্লাহর। যে সমস্ত আইন শারীআর বিপরীত, তার সবই স্থান পায়ের তলায়। শর্তহীন পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব থাকবে শুধু শারীআর নিয়ন্ত্রণে। শারীআর সমকক্ষ কর্তৃত্ব অন্য কারও থাকবে না। অধিকাংশ মানুষ রায়, পশ্চিমা মূল্যবোধ কিংবা সামাজিক সাংস্কৃতিক কোন কিছুই শারীআর ঊর্ধ্বে দূরে থাক, সমকক্ষও হতে পারবে না।

যে বিষয়টি বর্তমানের অধিকাংশ ইসলামপন্থীগণ এড়িয়ে যাচ্ছেন বা আলোচনায় আনছেন না, তা হচ্ছে রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় দ্বীন বা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে ইসলামি মূল্যবোধের ওপর, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে কমিউনিজমের ওপর কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর।

ইসলামি রাষ্ট্রে শারীআ বা বিধানের অবস্থান রাষ্ট্রেরও উপরে, বিপরীতে সেক্যুলার রাষ্ট্রে বিধানের অবস্থান মূলত রাষ্ট্রের অনুগামী। অর্থাৎ, ইসলামে রাষ্ট্রের ভূমিকা হচ্ছে উপকরণের, যা মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের উপযোগী করে তুলবে। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভুর ন্যায়, যেখানে সকল কিছুই চূড়ান্ত হয় কেবল রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে।

একটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান ৩টি- ভূমি, জনগণ ও কাঠামো । উত্তর আমেরিকার মূল অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের ভূমি ও জনগণ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা কাঠামো না থাকায় তারা পরাধীন। আবার ফিলিস্তিনের জনগণ ও সরকার কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ভূমি না থাকার কারণে, রাষ্ট্র হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায় না। ইসলামি রাষ্ট্র হোক অথবা আরব জাতীয়বাদী, সমাজতান্ত্রিক কিংবা অন্য কোনো আদর্শের রাষ্ট্র হোক, এই মৌলিক উপাদানগুলোর অস্তিত্ব জরুরি।

যেমনিভাবে, রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণাদিও তেমনি জাগতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এবিষয়ে আলোচনাকে সামনে নেয়ার আগে, জাগতিক বিষয় বলতে কী বোঝানো হচ্ছে তা স্পষ্ট করে নেয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
>
> নিশ্চয় আমি (তাকেই), পৃথিবীর শোভা করেছি যা কিছু সেটার ওপর রয়েছে, যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম।
>
> (১৮:০৭)
>
> قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
>
> (তারা) বললো, ‘আমরা নির্যাতিত হয়েছি আপনি আসার পূর্বে এবং আপনার শুভাগমনের পরে’ বললো, ‘শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তার স্থলে জমিনের মালিক তোমাদেরকে করবেন। অতঃপর দেখবেন (তোমরা) কেমন কাজ করো’।
>
> (০৭:১২৯)
>
> وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
>
> এবং আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন আর এ জন্য যে, প্রত্যেক সত্তা আপন কৃতকর্মের ফল পাবে এবং তাদের প্রতি যুলম হবে না।
>
> (৪৫:২২)

অর্থাৎ, দুনিয়ার সকল উপকরণাদি এবং যা মানুষের আয়ত্তাধীন তার সবই আল্লাহ তাআলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত। মানুষ এসব উপায় উপকরণ অবলম্বন করে আল্লাহর ইবাদাত কায়েম করবে। দুনিয়া তার লক্ষ্য হবে না, আবার সে দুনিয়ার বাস্তবতা অস্বীকারকারীও হবে না। যেমন, মানুষের জীবনধারনের জন্য খাদ্যগ্রহণ অপরিহার্য কিংবা পারস্পারিক লেনদেনের জন্য মুদ্রা অপরিহার্য ইত্যাদি। এসবই জাগতিক বস্তু, কিন্তু মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোনো খাবার, পোশাক বা লেনদেন ইসলামি হয় আবার, কখনো তা গাইরে ইসলামি হয়।

অর্থাৎ, শারীআতের আহকাম সবই জাগতিক বিষয়ের ওপর আপতিত হয়। শারীআতের আহকামের অনুগমনের মাধ্যমেই জাগতিক বিষয়াবলী শরয়ী বিষয়ে পরিণত হয় এবং এসবের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম

বাস্তবায়নই হচ্ছে মূলত আল্লাহর তাআলার পরিপূর্ণ ইবাদাত।

রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়। আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ার কারনেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। আর ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত প্রতিটি জামাত ও তাদের সদস্যবৃন্দ এবিষয়ে একমত। খাদ্য, পানীয়, পোশাক, ইত্যাদির বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে মুমিন কাফির নির্বিশেষে সকলকে নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ বিষয়টি অগ্রাহ্য না করলেও, জমীনে তামকিন লাভের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ইসলামপন্থীরা দ্বিধান্বিত হয়ে যান। ক্ষুধা নিবারনের জন্য সময় বা খরচ কমাতে গাছের পাতা বা মাটি খাওয়া শুরু না করলেও, কিংবা শরীর আবৃত করতে চটের বস্তা গায়ে জড়িয়ে তাওয়াক্কুলের কথা না বললেও, ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে তারা ঠিকই গনতন্ত্র, মিটিং-মিছিল আর আলোচনার টেবিলকে গ্রহণ করে ফেলেন।

তামকীন লাভ বা রাজনৈতিক প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্য বাস্তবতা ও জাগতিক উপায় উপকরনের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা গ্রহণ থেকে তারা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছেন। ফলে প্রায় শত বছর ব্যাপী কার্যক্রম পরিচালিত করা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন তো দূরের বিষয়, ব্যর্থতার চোরাবালিতে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচতেই আজ তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। বছরের পর বছর একই গর্তে বার বার পতিত হবার পর, 'তাওয়াক্কুল' আর 'নিকটবর্তী বিজয়' এর বয়ানকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তাআলার নিজামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ইসলামি আন্দোলনগুলো কখনই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। টিকে থাকা আর সদস্য সংগ্রহ এক বিষয়, উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা ভিন্ন বিষয়।

তামকিন লাভ কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে মৌলিক বাস্তবতা হল, যখন একটি আদর্শকে হটিয়ে ভিন্ন আদর্শ প্রতিস্থাপিত করতে হয় তখন সংঘাত অনিবার্য। বিশেষ করে যখন হক্ক বাহ্যিকভাবে দুর্বল ও সংখ্যায় কম হয়, তখন এটাই বাস্তবতা যে, সংঘাত অনিবার্য।

আল্লাহ তাআলা তাই ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদকে মুসলিমদের জন্য ফরয করেছেন। কেননা জমীনে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা লাভ কেবলমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব, আর আল্লাহ তাআলার শরীয়ত নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সঠিক পথের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে।

যখন ইসলামি শাসনব্যাবস্থা বিলুপ্ত হলো; উম্মাহ বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হলো, কাছাকাছি সময়ে লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন শুরু হলো মুসলিমদের ভূমিগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত বীজ বপন। ক্রমান্বয়ে এমন অল্প কিছু লোকের হাতে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের কর্তৃত্ব চলে গেল যাদের এর আগে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করার মতপ জায়গাটুকুও ছিল না।

আধুনিক বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে মুসলিম উম্মাহ বিভিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হবার পর। ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অসংখ্য ইসলামি দল-উপদল, যাদের প্রায় প্রতিটির নের্তৃবর্গই ইসলামি রাষ্ট্র বা খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার দাওয়াতকে সামনে রেখে কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। এদের কোনো কোনোটি অঙ্কুরেই ঝরে গেছে আবার কোন কোনটির বয়স ৫০/৬০ বছর কিংবা ১০০ বছরের কাছাকাছি। এই দীর্ঘ সময়ে অন্তত অল্প পরিমান সফলতা তো কাম্য ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত নিজামের বিপরীতে হাটা এসকল দল, সংগঠন ও মাসলাকগুলো ব্যর্থতাকে নিজেদের জন্য অবশ্যক করে নিয়েছে। কেউ যদি উত্তপ্ত বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হাজার বছর ধরেও করে, তবুও কি তার পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব? পশ্চিম দিকে রওনা হওয়ার পর কি পূর্বে পৌঁছানো সম্ভব?

যদি তাকে বলা হয় যে, সে উল্টো পথে হাটছে, আর সে যদি উত্তর দেয়, অধ্যবসায়, সবর, ইয়াকিন, ইখলাস ও তাওয়াক্কুল তাকে সফলতা এনে দিবে; তবুও কি আমরা বলব যে, তার সফলতা অর্জন সম্ভব!

হ্যাঁ, কেউ যদি আসলেই ইখলাস ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করেন, দুনিয়াতে ক্ষতি পৌঁছালেও তিনি আখিরাতে সফলতা পাবেন। কিন্তু আসবাবের জগতকে সামনে রেখে বলা যায় তা ব্যর্থতাই বয়ে আনবে। এটি স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত বিষয় যে- গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা বাথিস্ট; যে কোন রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সশস্ত্র সংঘাত অনিবার্য। অধিকাংশ ইসলামপন্থীরা স্বেচ্ছায় অবস্থায় বিভিন্ন বাতিল শক্তির সাথে আপোসকামি হয়ে, তাদের দেয়া সীমারেখা মেনে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলেন। তাদের প্রতি এবং তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও প্রচেষ্টাসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন করে, ন্যূনতম যা না বললেই নয়-

'এসকল রাজনীতি চর্চাকারীগণ হয় ইসলাম পরিপূর্ণভাবে বোঝেন নি, অথবা এসকল রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতা বোঝেন নি। অথবা উভয়টির ক্ষেত্রেই রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ, খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ বুঝ।'

তীব্র সংঘাত ছাড়া কোনো আদর্শকে অন্য আদর্শ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে? কোন আদর্শ কি প্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী হয়েছে পূর্বোক্ত আদর্শের অনুসারীদের অনুগত করা ব্যতীত? - পৃথিবীর লাইব্রেরীসমূহে অমৃত্যু সময় কাটিয়েও কি একথা প্রমাণ করা সম্ভব?

এসকল ইসলামপন্থীরা যদি সাম্প্রতিক ইতিহাসকেও কিছুটা হলে সঠিকভাবে কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো, তবে তারা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র, দাওয়াত, তাবলীগ বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকতেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বামপন্থীরা শুন্য হাতে অথর্ব, চরিত্রহীন কার্ল মার্ক্স আর ফেডরিক এঙ্গেলস এর অন্তঃসারশূন্য, বিকৃত মতবাদ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংকল্প করে।

পৃথিবীর কোণায় কোণায় কমিউনিজম কায়েমের আন্দোলন শুরু হয়। আর ওই আন্দোলনের সফলতা অর্জনের পথে তাদের কারোরই সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনার ব্যাপারে দ্বিমত করতে হয়নি। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, ইসলামের প্রাণকেন্দ্রেও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। অথচ, এদেশগুলোর কতজন কমিউনিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞাটুকু জানে?

অথচ, দুঃখজনক বাস্তবতা হলো ইসলামি রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত হলো। দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ ও পন্থা কীভাবে হবে সে বিষয়ে অনেকে এখনো সংশয়ে ভুগছেন! আমাদের দেশে মাওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমানদের মতো ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো; অথচ কতজন তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী। বিপরীতে হাফেজ্জি হুজুর রহঃ কোটি কোটি অনুসারী, হাজার হাজার বাইয়াত মুরীদ (যারা এক কথায় জীবন দিতে প্রস্তুত) থাকা সত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কদূরে থাক নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতেই হিমশিম খেয়ে গেলেন। আরবে বাথিস্টরা কয়েকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে সক্ষম হল, অথচ তারা শুরুর দিকে নিজেদের নামের আগে আলহাজ্জ/হাজী না লাগিয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট পর্যন্ত করতে পারতো না। বিপরীতে, আল্লামা আলী তানতাভী রাহঃ এর এক বয়ানে গোটা দামেস্কবাসী আন্দোলিত হতো।

সারকথা হল, রাষ্ট্র (এখানে জাতিরাষ্ট্রকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে) একটি জাগতিক বিষয়, যা সর্বজনীন। পার্থক্য শুধু মূল্যবোধের। একটি ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি শরিয়াতের ভিত্তিতে পরিচালিত, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কমিউনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও সুনির্দিষ্ট। আর শরিয়ত সেদিকেই আহবান করে যাতে আছে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও মর্যাদা।

তাই, বাস্তবতা উপলব্ধি করে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান অন্যদের তুলনায় সহজ ও দ্রুততমভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। কেননা, মুসলিমদের সাথে রয়েছে আল্লাহ তাআলার তাওফিক, ওয়াদা ও সাহায্য। আরও রয়েছে সর্বোত্তম পথনির্দেশ, কুরআন ও সুন্নাহ ।

যারা দীর্ঘ সময় মেহনত, প্রচুর কুরবানী সত্ত্বেও সাফল্য না পাওয়াকে শাখাগত সমস্যা মনে করেন, বা কোনো সমস্যাই মনে করেন না; তারা যেন বোঝাতে চাইছেন শরীয়ত আমাদের ভূল পথের দিকে পরিচালিত করছে। না! বরং আমরাই ভূলের ওপর আছি। ইসলামি আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ঢালাও ও অস্পষ্ট চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসা আবশ্যক। সমন্বিত ও সুসংগঠিত ইসলামি কর্মধারার হাকিকত ও প্রয়োগের ব্যাপারে গভীর উপলব্ধি হচ্ছে নূন্যতম দাবি, যা ইসলামের স্বার্থে বাস্তবিক ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

আর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(৩)

একটি সংশয়ের অপনোদনঃ-

সেক্যুলাররা ইসলামি শাসনের সহনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে। এর স্বপক্ষে অতি-আলোচিত একটি অভিযোগ হল,

ইসলামি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে অন্য আদর্শ বা ধর্মের, কারো কোন অংশীদারিত্ব থাকেনা।

সম্প্রতি আফগানিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর, এ আলোচনাটি বারবার সামনে এসেছে।

কথা হচ্ছে, ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় যেমন সেক্যুলার বা ভিন্ন আদর্শের কাউকে শাসনকাঠামোতে বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রাখা হয়

না; একই কথা কি সেক্যুলারদের ক্ষেত্রে খাটে না!?

জাতিয়তাবাদের মূলনীতি অনুযায়ী, পাকিস্তান বা ভারতীয় মুসলিমদের ওপর বাংলাদেশী হিন্দুদের অগ্রাধিকার দেয়ার আকিদা না রাখলে, প্রকাশ্যে এই মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে- কোনো মুসলিম কি সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা বা নীতিনির্ধারণে অংশ রাখতে পারবে?

সকলেই জানেন, এমন হওয়া সম্ভব না।

সেক্যুলার লিবারেল আদর্শের যে মূলনীতি রয়েছে, (যেমন, সাম্য, নারীবাদ, গণতন্ত্র, বিয়ের সময়সীমা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিপালন ইত্যাদি) তার কোনো একটি লংঘিত করলেও, কোনো মুসলিম কি অন্যান্যদের মতো সুবিধা পাবে! অবশ্যই না। অন্য আদর্শকে প্রবল হতে না দেয়া এক স্বাভাবিক বাস্তবতা। বরং, ইসলামপন্থীদের তুলনায় অন্যরা মোটেও সহনশীল নয়। সুদূর অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, নিকট অতীত থেকেই দেখা যায়-

জোসেফ স্টালিন কি শুধুমাত্র কমিউনিস্ট না হওয়ার 'অপরাধে' গুলাগে কোটি কোটি লোক বন্দী করেনি!? ওয়ার কমিউনিজমের নামে কি কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়নি? আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানদের এক্ষেত্রে কট্টরতা তো আরও বেশী। তারা নিজ দেশে তো বটেই, অন্য দেশেও নিজেদের 'সেক্যুলার লিবারেল' মূল্যবোধের বিপরীত কিছু সহ্য করে না। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, হাংগেরী, ইতালীসহ বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত পর্যায়েই ইসলামি মূল্যবোধকে আক্রমণ করা হয়, হচ্ছে।

অসম্পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত শাসন ও নৈতিকতা যদি এতই অবিভাজ্য হয়, তাহলে যা মানুষ ও সকল সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত- তা কি মুসলিমদের নিকট আরও অবিভাজ্য হবে না?

সেক্যুলাদের মধ্যে যারা, মুসলিমদের শাসনের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে থাকে, তারা প্রকারান্তরে নিজ মূল্যবোধের সাথেই বেঈমানি করে। প্রবল হওয়ার পর, আধিপত্য পাবার পর আদর্শের ক্ষেত্রে আপস দুনিয়ার কোনো জাতিই করেনি, করে না, করবে না। অজ্ঞ, বেওকুফ ও আত্মঘাতী মানসিকতাসম্পন্নদের কথা আলাদা। তবে, দূর্ভাগ্যজনকভাবে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, তিউনিশিয়ার আন নাহদা পার্টি ও জামাতে ইসলামির মতো শৈথিল্যপরায়ণ দলগুলো, এসংস্কৃতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছে।

সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, কমিউনিজম বা ক্রিশ্চিয়ানিটির শাসনকাঠামোতে যদি অন্য আদর্শের মানুষ সমস্তরের আসন না পায় বা অধীনস্ত অবস্থায় থাকে; তাহলে ইসলামি শাসনের ক্ষেত্রে কেন তা আশা করা হচ্ছে বা হবে?

আচ্ছা, ইসলামি আইনে দক্ষ কোনো আলেম কি চলমান ব্রিটিশ আইনে পরিচালিত বিচারব্যবস্থার অংশ হতে পারবে?

না, এ নিতান্তই অসম্ভব। তাহলে বিপরীতটিও যে অসম্ভব, তা কেন বোধগম্য হচ্ছে না?

মুসলিমদের জন্য নির্দেশিত অখন্ডিত, অলংঘনীয় মূলনীতি হলো প্রবৃত্তির অনুগামীদের অনুসরণ না করা। তাহলে প্রবৃত্তির অনুসারী সেক্যুলার, লিবারেলদের নির্বাহী বা বিচারিক ক্ষেত্রে পদায়নের মাধ্যমে, আপামর জনতাকে তাদের আনুগত্যের অধীন করা কিভাবে সম্ভব?

> وَ لَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَہٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ اتَّبَعَ ہَوٰىہُ وَ کَانَ اَمۡرُہٗ فُرُطًا
>
> "আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না--- যার অন্তরকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।"

দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, সেক্যুলারদের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা- ইনসাফ ও সুস্থ আকলের বিপরীত।

কোনোপ্রকার সংকোচ ও ভণিতা ছাড়াই বলা যায়, ইসলাম প্রত্যেকের প্রাপ্য সবচেয়ে ভালোভাবেই সরবরাহ করে। পুত্র পিতার সমান সম্মান পায় না, মূর্খ জ্ঞানীর সমান না।

এটা বে-ইনসাফি না, তা উন্মাদও বোঝে।

তাই যে ইসলামি আদর্শকে স্বীকার করে না, ধারণ করে না, ইসলামি শাসনকাঠামোর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি জানে না; সে সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা ও নির্বাহী সক্ষমতার বিচারে পিছিয়ে থাকলে, তা কিভাবে ইনসাফের বিপরীত হতে পারে? বরং, এটাই বাস্তবতার দাবি। স্মর্তব্য যে, সমতা আর ইনসাফের অর্থ ভিন্ন।

বিগত দুশ বছরের অসংখ্য লিবারেল রাষ্ট্রগুলোর সকল স্তরের (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক) অধঃপতন কি তা প্রমাণ করে না যে, সাম্য ও স্বাধীনতার সর্বোচ্চকরনের নামে অবাধ ও লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা শান্তি ও ইনসাফ আনতে অপারগ?

সুতরাং, সেক্যুলাররা যে ইসলামি শাসনের ভাগীদার হওয়ার যে দাবি জানায় তা- স্ববিরোধী। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিকভাবে বাতিল, অনৈতিক এবং অবাস্তব।

যদি শাসনব্যবস্থা, বিচারিক ও নির্বাহী ক্ষেত্রে কেউ ভূমিকা রাখতে চায়, ইসলামি শরিয়ত ও বিশ্বজনীন মূলনীতি অনুসারে তার উচিৎ, ইসলামি মূল্যবোধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া।

কেননা, ইসলামপন্থীদের মৌলিক নীতি হচ্ছে-

مَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

"... বিভ্রান্তদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই।"